সমাজে লেখ্যাগারের ভূমিকা

সংগ্রহশালা যেমন একটি বহুল প্রচলিত সংস্থা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত মানুষই সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম বললে এক কথায় বুঝে যায়। কিন্তু লেখ্যাগার বা আর্কাইভ সমাজের খুব সীমিত সংখ্যক মানুষের কাছে পরিচিত। শিশু বা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সংগ্রহশালা যেমনভাবে পরিচিত, দেখা যাবে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীই হয়ত লেখ্যাগার বা আর্কাইভ কি তা জানে না। সুতরাং লেখ্যাগারের প্রচলন কম হওয়ায় তার সমাজে প্রভাবও কম। আসলে লেখ্যাগার শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে অতপ্রোতভাবে জড়িত তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখ্যাগারের সামাজিক ভূমিকা শিক্ষা ও গবেষণা আবর্তিত। যাই হোক লেখ্যাগারের সামাজিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। লেখ্যাগারের প্রধান ভূমিকাগুলো হলো—

(ক) নথির বা পান্ডুলিপির সংরক্ষণ

(খ) তথ্য ভান্ডার

(গ) সাংস্কৃতিক স্মৃতিগার

(ঘ) ঐতিহাসিক ও সামাজিক চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র।

(ক) নথি ও পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ : যে-কোনো দেশের কেন্দ্রীয় লেখ্যাগার সেই দেশের সরকারী সমস্ত নথি সংরক্ষিত রাখে। দেশের আঞ্চলিক সরকারের আলাদা করে লেখ্যাগার থাকে। যেমন আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে ন্যাশানাল আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া আর রাজ্যভিত্তিক আর্কাইভের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য লেখ্যাগার উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সরকারি নির্দেশিকা, আইনসভার তথ্য, বিচারবিভাগীয় নির্দেশিকা প্রভৃতি কম্পিউটারের মাধ্যমে বিতরণ ও সংরক্ষণ হলেও, তার মূল কপি কাগজে ছাপিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রাখা হয়। তা ছাড়া ডিজিটাল যুগ আসার পূর্বে সরকারী সমস্ত তথ্যই কাগজে লিপিবদ্ধ করা হতো। সুতরাং এই সব সরকারী নথির সবই প্রায় কাগজের বস্তু। আর আমরা জানি কাগজ এমন একটি বস্তু যা সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই বিপুল গুরুত্বপূর্ণ নথিকে সঠিকভাবে সংরক্ষিত রাখাটা লেখ্যাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ছাড়া প্রাচীনকালে সংগৃহীত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি যা আমাদের তৎকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে তা সংরক্ষিত রাখার গুরু দায়িত্ব হলো লেখ্যাগারের। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে এরকম বহু পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

(খ) তথ্যভান্ডার : লেখ্যাগারগুলি হলো সমাজের দলিল। এক একটি লেখ্যাগার হলো তথ্যভান্ডার আর সেই তথ্যভান্ডারের প্রতিটি অংশে লুকিয়ে থাকে কোনো অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা। লেখ্যাগারের মাধ্যমে সরকারী বা অনেকক্ষেত্রে বেসরকারী ঐতিহাসিক নথি বা পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করে রাখার মূল কারণ হলো সামাজিক তথ্যগুলি বাঁচিয়ে রাখা। এই তথ্যভান্ডার থেকে একদিকে যেমন সমাজের কথা জানা যায় তেমনি বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে কোনো বিষয়ে পূর্ববর্তী সরকারের কর্ম কি ছিল সেই বিষয়েও অবহিত হতে এই তথ্যভান্ডার কাজে লাগে।

(গ) সংস্কৃতির স্মৃতিগার : আদিম যুগ থেকেই মানুষ তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনা চিত্র ও লেখার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে রাখতো। প্রাচীনকালে গুহাচিত্র এরই নিদর্শন। এরপর তালপত্র, ভোজপত্র, শিলালিপি, মৃত্তিকালিপি প্রভৃতিতে মানুষ তার নিজস্ব গোষ্ঠীর বা শাসকের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখতো। তারপর কাগজ আবিস্কারের পর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনা লিপিবদ্ধ করার কাজ আরও এগিয়ে চললো। সেই সব নথি ও পাণ্ডুলিপি আজও লেখ্যাগারের মূল সম্পদ। কাগজে লিপিবদ্ধ মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবিগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাবনা চিন্তা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি মনে করিয়ে দেয়। তাই লেখ্যাগারকে অতীতের স্মৃতি ধরে রাখার ঘর বলা যেতে পারে।

(ঘ) ঐতিহাসিক ও সামাজিক চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র : প্রকৃতপক্ষে লেখ্যাগারের মূল অবদান হলো যে-কোনো ঐতিহাসিক ও সামাজিক চর্চা ও গবেষণায় সাহায্য করা। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বিষয় সম্পর্কিত অগাধ জ্ঞান পেতে পারে লেখ্যাগার থেকে। লেখ্যাগারে সংরক্ষিত নথি ও পাণ্ডুলিপি হলো ইতিহাসের জীবন্ত উপকরণ। বহু শিক্ষার্থী বা গবেষকরা লেখ্যাগার থেকে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করে সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনেক নতুন নতুন দিক উন্মোচন করেছেন।

সংগ্রহশালা ও লেখ্যাগার সম্পর্কিত কতকগুলি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থা

আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম কাউন্সিল (International Council of Museums or ICOM) :

সারা পৃথিবীর সংগ্রহশালাগুলির সবচেয়ে বড় সংস্থা হলো আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম কাউন্সিল বা সংক্ষেপে আইকম। ১৯৪৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার প্রথম প্রেসিডেন্ট চুনসে. জে.